Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন: প্রসঙ্গ ইতিহাস

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Jannat Ara Sohely
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.8
Pages	১১৭-১৪২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন: প্রসঙ্গ ইতিহাস

Check for updates

জান্নাত আরা সোহেলী

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ১১৭-১৪২
DOI 10.62328/sp.v58i3.8

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* : প্রসঙ্গ ইতিহাস

জান্নাত আরা সোহেলী*

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা কাব্যনাট্যের শৈল্পিক রূপায়ণে সৈয়দ শামসুল হক অনন্যসাধারণ, অবিকল্প নির্মাণশিল্পী। কবিতা ও কথাসাহিত্যের মতোই, অনুবাদ-নাটক, বিশেষত আঞ্চলিক ভাষায় বাস্তবগন্ধী কাব্যনাটক সৃজনে তাঁর আগ্রহ ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। তাঁর কাব্যনাটকসমূহের অবয়বে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস, নিজস্ব সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্য, সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনীতি আর জাতিগত অপার সম্ভাবনার প্রতিচিত্র। ফলত তাঁর কাব্যনাট্য হয়ে উঠেছে বাঙালির শক্তি-সাহস, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সংগ্রাম-সংক্ষোভ আর উজ্জীবনের অসামান্য রূপকল্প। এর অনন্য দৃষ্টান্ত বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে তাঁর রচিত কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবন*। এ কাব্যনাট্যটির ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানই আমাদের প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

১

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) কেবল বাংলাদেশের বহুমাত্রিক লেখকদের একজন নন, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণভাবে সুনির্ণীত। শব্দ ও বাক্যের সুমিত প্রয়োগে, মিথ-পুরাণের যুগোপযোগী উপস্থাপনায়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে এবং বাঙালি জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক উৎসানুসন্ধানে তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস ও নিরীক্ষাধর্মী। তাঁর রচনায় আবহমান বাঙালির পরিচয় যেমন সমুদ্ভাসিত হয়েছে, ঠিক তেমনি তাদের ব্যর্থতা ও গৌরবিত অর্জনগুলোও অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ভাষারূপ পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের এই বিরল প্রতিভা এবং অর্জন নিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

> গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-চিত্রনাট্য-গান, যেখানেই তিনি বিচরণ করেছেন সেখানেই তাঁর সৃষ্টিশীল মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুরু করেছিলেন গল্প দিয়ে, সর্বাধিক পরিচিতি পেলেন কবি হিসেবে, জনপ্রিয় হলেন নাট্যকার হিসেবে। মাত্র ৩১ বছর বয়সে পেয়েছিলেনপ্রথম স্বীকৃতি ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আর ২০০০ সালে পেলেন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার। ১৯৮৪তেই পেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় একুশে পদক। অগণিত পুরস্কার আর সম্মাননার চেয়ে বড়ো পুরস্কার ছিল মানুষের ভালোবাসা – যার প্রমাণ মিলেছে তাঁর শবদেহকে ঘিরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আর কুড়িগ্রামে গুণগ্রাহী মানুষের বিপুল সমাগমে। (রামেন্দু, ২০১৬: ৪৪)

বহুমাত্রিক সৃজনশীলতার বিচারে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই ঘটেছে তাঁর স্পর্ধিত বিচরণ। প্রায় একাশি বৎসরের আয়ুষ্কালে কবিতা-উপন্যাস-নাটক-ছোটগল্প-প্রবন্ধ

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ও জীবনীগ্রন্থ মিলিয়ে প্রায় শ-খানেক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে ৩৫টি উপন্যাস, ২০টি কাব্যগ্রন্থ এবং মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে ১৪টির মতো নাটক রয়েছে। তাঁর কাব্যনাটকের সংখ্যা ১০; যেগুলোতে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর সৃজনী প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।[১]

২

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকটি রচিত হয়েছে বাংলার বিস্মৃতপ্রায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসন আর লুটতরাজের বিরুদ্ধে এদেশের অসহায় নির্যাতিত কৃষকবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে। বস্তুত, দীর্ঘ প্রবাস-জীবন যাপনকালে বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ আন্দোলন নিয়ে নাট্যকারের অসীম কৌতূহল ও নিবিড় পঠন-পাঠনের ফল এই নাটক। বাংলাদেশে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে, নাগরিক নাট্যদলের সনিষ্ঠ প্রযোজনায়। উত্তরবঙ্গের জনজীবন থেকে তুলে আনা এক কৃষক নেতার অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করে ঢাকার দর্শক বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে যায়। নূরলদীনের ‘জাগো বাহে, কোনঠে সবায়’ রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা-পরিসর অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সর্বযুগের সংগ্রামশীল মানুষের দিগন্তপ্রসারী আহ্বান। আশির দশক থেকে অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিছিলে-জনসভায় এই সংলাপটিই হয়ে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের উজ্জীবনের সুধামন্ত্র। ফলে নাটকটি, বিশেষত নূরলদীনের নাম এদেশের সারস্বত পরিমণ্ডল ছাপিয়ে আপামর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আর এভাবেই নাটকটি পৌঁছে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে, বিশেষত কাব্যনাট্যের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা।

বস্তুত, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসের খণ্ড পরিসর থেকে বিস্মৃতপ্রায় এক কৃষক নেতাকে দৃশ্যকাব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করে বৃহত্তর জনচিত্তে তাকে প্রতিষ্ঠা করার এক যুগান্তসৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পাদন করেছেন সৈয়দ হক। ইতঃপূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) হাতে যে-সব কাব্যনাট্য রচিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষাপট কখনো ব্যক্তির হৃদয়জাত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ, আবার কখনোবা পুরাণ-আশ্রিত ঘটনার নবরূপায়ণ। কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব ইতিহাসকে পুঁজি করে গণমানুষের সংগ্রামী জীবন নিয়েও যে কাব্যনাট্য রচনা করা সম্ভব, বাংলা সাহিত্যে সেটিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক। নবধারায় নির্মিত সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম দুটি নাটকের তুমুল এই জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমালোচক অলোক বসু বলেছেন:

> ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত, অন্যদিকে ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ ব্রিটিশ আমলে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত যা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেরই একটা অংশ। [...] দু’টি নাটকের মূলে যেমন রয়েছে বঞ্চনার কথা, তেমনি রয়েছে প্রতিবাদ-সংগ্রামের কথা। বাঙালির জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এ উপাদান দু’টি অর্থাৎ বঞ্চনা ও সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। [...] ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া

যায়' এবং 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটক দু'টিতে অত্যন্ত গভীরভাবে মিশে আছে বাঙালি জাতির চৈতনিক উপাদান। সৈয়দ শামসুল হকের কৃতিত্ব, তিনি নাটকের পাত্রমিত্রদের মুখে প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দমালা, কথনভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যদিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার উপাদানসমূহ। [...] বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক-মানসিক গড়নকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাদের কথা-বার্তা, পারস্পরিক আচার আচরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির হাজার হাজার বছরের যে কৃষিনির্ভর, শ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে কামার, কুমার, সুতার প্রভৃতি পেশার মানুষের যে সন্নিবেশ তার কথাই বলেছেন। বলেছেন এই জনপদের কথা, এই মাটির কথা, এই মাটির মানুষের কথা, তাদেরই ভাষায়। (অলোক, ২০১৭: ১৩৭)

প্রায় দুশো বছর পূর্বের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক মাটিচাপা কৃষক আন্দোলনের মর্মান্তিক ইতিহাসের পুনর্জন্ম ঘটেছে সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকে। এটি ছিল বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়, ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগোষ্ঠীর, বিশেষত কৃষকশ্রেণির প্রতিবাদ। লেখক সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন-সংগ্রামকে উপজীব্য করে আলোচ্য নাটকের ঘটনাংশ নির্মাণ করলেও এটিকে শিল্পগুণমানে উন্নীত করার প্রয়োজনে তিনি স্থান-কাল উপযোগী কাল্পনিক ঘটনা, চরিত্রপাত্রের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পলোক-আশ্রিত ঘটনা ও চরিত্রের মিথস্ক্রিয়ায় এটি হয়ে উঠেছে একটি শিল্পোত্তীর্ণ কাব্যনাটক। প্রসঙ্গক্রমে সৈয়দ শামসুল হকের বক্তব্য স্মর্তব্য:

ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও গুডল্যাডকে; কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আব্বাস, আম্বিয়া, লিসবেথ, টমসন ও মরিসকে। নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন – নূরলউদ্দিন, আমরা বলব ওটা হবে নূরুদ্দিন, কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি – নূরলদীন, রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে।' (সৈয়দ শামসুল, ২০১৬: ৮৩)

রংপুর জেলার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের একাধিক রচনায় রংপুরে ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত নবাব নুরউদ্দীন নামক এক কৃষক নেতার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান রচিত *রংপুর জেলার ইতিহাস* (প্রথম পর্ব) গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে কৃষক নুরউদ্দীন এবং তার নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহ প্রসঙ্গ:

১৭৮৩ খৃস্টাব্দে জানুয়ারীতে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 'নুরউদ্দীন' নামক এক ব্যক্তি তাদের নবাব ও 'দয়াশীল' তাঁর দেওয়ান নির্বাচিত হন। তৎকালীন টেপার জমিদারের নায়েব বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে কাকিনা, ফতেপুর, কাজির হাট এবং টেপা পরগণার প্রজাসকল দলবদ্ধভাবে নায়েব ও গোমস্তা প্রভৃতিকে হত্যা করে। [...] রংপুরের বিদ্রোহীদল কোচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাগণ তাদের

> অধীনে সমবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। তারা ইংরেজদের রাজস্ব কর প্রদানের নিষেধাজ্ঞা জারী করে বিদ্রোহীদের চাঁদা (টিং খরচা) স্থাপন করে। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে কর সংগ্রহে দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। (লুৎফর, ১৩৮২: ৩৭)

Gazetteer of Rangpur District, ১৯১১-এ উল্লেখিত আছে:

> The exactions of a notorious farmer Raja Deboi Singh of Dinajpur, caused an insurrection of the cultivators in 1783. The revenue officers were driven out. A petition of grievances was submitted to the collector, who offered. various concessions, which did not serve to quell the disturbance. The insurgents committed several murders, and issued a proclamation that they would pay no more revenue. They forced the cultivators of Cooch Behar to join them, and sent parties into Dinajpur to raise the people there. One of the leaders assumed the title of Nawab; and a tax called dingkharacha, or sedition tax, was levied for the expenses of the insurrection. (ফরিদ ২০১৫)

সৈয়দ শামসুল হক অবশ্য আলোচ্য কাব্যনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র কোম্পানির ফৌজি অফিসার ম্যাকডোনাল্ডকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি, কিন্তু এই চরিত্রটিও যে বাস্তবে ছিল সে-প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সে সময়কার ইতিহাস নিয়ে রচিত একাধিক গ্রন্থ ও দলিলপত্রে। যেমন, *Bangladesh Distric Gazetter is Rangpur* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> A party of sepoys under lieutenant Macdonald marched to the North against the principal body of the insurgents and decisive engagement was sought near patgram in February 1783. (Nurul, 1977: 45)

Hunter's Statistical Accounts of *Bengal* (১৮৭৭) গ্রন্থের লেখক Sir William Wilson Hunter (১৮৪০-১৯০০) এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রংপুরের কৃষকগণ হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং রাজস্ব আদায়কারীদের বিতাড়িত করেন। তারা তাদের নেতা নবাব নুরুদ্দীনকে নবাব বলে ঘোষণা করেন এবং খাজনা প্রদান বন্ধ করেন। তাদের দাবি দাওয়া স্থানীয় কালেক্টরের নিকট পেশ করেন। বিষয়টি অমীমাংসিত হলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে সিপাহী দল স্বয়ংসম্পূর্ণ নবাব নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে মোঘলহাট যুদ্ধে নবাব আহত এবং তাঁর সেনাপতি দয়াল নিহত হন। এ সময় অবশিষ্টাংশ বিদ্রোহীদল পাটগ্রাম অঞ্চলে অবস্থান করেন। পরদিন অন্য সিপাহীদল সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে হঠাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৩ সালে পাটগ্রাম আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিদ্রোহী দলকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধে ৬০ জন বিদ্রোহী নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হয়ে বন্দী হন। (মোস্তফা, ২১৭: ৫৬)

নুরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাট্যে বস্তুত হান্টার কর্তৃক রচিত এ ইতিহাসের অনুসরণ রয়েছে। কিন্তু নাট্যকার সৈয়দ হক নাট্যকাহিনিতে দয়াশীলকে মৃত না দেখিয়ে নুরলদীনকে মৃত দেখিয়েছেন। হতে পারে এর পেছনে লেখকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল। হতে পারে এই মৃত্যুকে তিনি প্রতীকী করে তুলতে চেয়েছেন; যেখানে একজন নেতার মৃত্যুশোকে লাখো জনতার জেগে ওঠার প্রেরণা মিলেছে। আর এ কারণেই হয়তো কাব্যনাটকের প্রারম্ভে মৃত নুরলদীনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবকের আহবানে উচ্চগ্রাম সংগীতের তালে আলোকের ঝর্নাধারায় অতি দ্রুত তিনি জেগে উঠেছেন, এবং তাঁর মাধ্যমেই চিত্রিত হয়েছে পুরো নাট্যঘটনা। বস্তুত, নূরলদীন শারীরিকভাবে বেঁচে না থাকলেও অক্ষত আছে নূরলদীনের বিপ্লবী আদর্শ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সে আদর্শ কখনো বিলীন হবে না। নাট্যকার নিজে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সমাজে প্রচলিত মিথ নির্মূলের প্রেরণা হিসেবে। সমালোচক শান্তনু কায়সার এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে লিখেছেন:

> নূরলদীনের স্বেচ্ছামৃত্যু'কে নাট্যকার মিথ নির্মূলের উপায় হিসেবে নির্দেশ ও গণ্য করেন। কিন্তু নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন দেখে নাট্যকারের ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে আমি লিখেছিলাম [...] স্বেচ্ছায় আত্মাহুতির রোমান্টিকতা একজন গণনায়কের থাকার কথা নয়। নয়, কারণ নূরলদীন ও নাট্যকার উভয়েরই জানার কথা, মৃত্যু মিথ তৈরিতেই বরং অধিকতর সাহায্য করে, নির্মূল করতে একেবারেই নয়। (শান্তনু, ২০১৮: ১৮০)

যদিও সৈয়দ শামসুল হক উত্তরাধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বে আস্থাবান নন[২], তবু তাঁর সৃষ্টিকর্মে নিবিড় দৃষ্টি স্থাপন করলে দেখা যাবে, ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোশ উন্মোচনে তিনি তুলনারহিত শিল্পী। মূলত, মানুষ ঔপনিবেশিক শক্তির বিশাল ও ব্যাপক বিস্তৃত আগ্রাসন থেকে রেহাই পেতে খুঁজে ফেরে নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও মিথকাহিনি; যাকে আশ্রয় করে মানুষ নিজস্ব শেকড় সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আর এভাবেই ঘটে ইতিহাস ও মিথের পুনর্জন্ম। সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে এই জাতিসত্তার ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন প্রান্তিক বীর নূরলদীনকে। কেন্দ্রীয় শাসনের অপরতাবোধের (otherness) দৌরাত্ম্যে যে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল কালের গর্ভে, সৈয়দ শামসুল হক নিবিড় মমতায় এই প্রান্তিক বীরকে ইতিহাসের পাতা থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন সেই সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ ও নির্মম আগ্রাসনের স্বরূপ। বস্তুত এটি কেন্দ্র নয়, প্রান্তের কাহিনি। যেখানে শিল্পের বিশালতর ক্যানভাসে উপস্থাপিত হয়েছে উপনিবেশিত সমাজের সামূহিক মুক্তির বাসনায় উদ্বেল একদল সাধারণ কৃষকের মর্মযাতনার প্রতিচ্ছবি ।

এ নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৭৮৩ সাল। আবার, বাংলাদেশে নীলচাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে ১৭৮৮ সালের পরবর্তীকালে। যদিও এদেশে নীলচাষের সূত্রপাত ঘটেছে মঁশিয়ে লুই বোনাদ নামক এক ফরাসি বণিকের মাধ্যমে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে।[৩] হতে পারে নাট্যকার বাংলার কৃষক বিদ্রোহের একটি যৌক্তিক কার্যকারণ তুলে ধরার নিমিত্তে

আলোচ্য কাব্যনাটকের পরিসর একটু বাড়িয়ে নিয়েছেন। এতে করে নাট্যঘটনায় যেমন ক্লাইমেক্স তৈরি হয়েছে, তেমনি নাট্যঘটনার প্রতি এবং নাটকের নির্যাতিত চরিত্রের প্রতি দর্শকের আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে।

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকের নূরলদীন, গুডল্যাড, দয়াশীল ঐতিহাসিক চরিত্র; একথা নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন। এছাড়াও ভবানী, গরীবুল্লাহ, হরেরাম প্রমুখ চরিত্রও ইতিহাসস্বীকৃত বাস্তব চরিত্র। লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় দোসর দেবী সিংয়ের নির্মমতার কথাও ইতিহাস-সমর্থিত। এছাড়াও নাটকে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থান, যেমন পাটগ্রাম, কাজীর হাট, পাংশা, ডিমলা, মোঘল হাট প্রভৃতিও বাস্তবসম্মত। নাটকটিতে লেখক প্রয়োজনানুসারে যেমন ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, ঠিক তেমনি কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রও জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ সৈয়দ শামসুল হকের *নূরলদীনের সারাজীবন* শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার উপস্থাপন নয়, বরং তার ভেতর কাল্পনিক উপকরণ শিল্পিত ঢংয়ে চিত্রিত হয়েছে, এবং নাটকটি হয়ে উঠেছে সমকালীন গণমানুষের যাপিত জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। গণনাটকের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য স্বীকরণ করেই এটি নির্মিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার নাটকের সবিনয় নিবেদন অংশে লিখেছেন:

> নিজেকে দেয়া অনেকগুলো কাজের একটি এই যে, আমাদের মাটির নায়কদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে কিছু করা, নূরলদীনের সারাজীবন লিখে তার সূত্রপাত করা গেল। যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন যেসব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সম্মুখে দেখব এবং জানব যে আমাদের গণ-আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার – সবার ওপরে, উনিশ শো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। (সৈয়দ শামসুল, ২০১৬: ৬৩)

বস্তুত, স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে বিরাজ করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে বিপথগামী জনসাধারণকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার তাগিদে, বিপর্যস্ত রাজনীতি ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকগণ বারবার ইতিহাসের বীরদের স্মরণ করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে সৈয়দ শামসুল হক ইংল্যান্ডে ছিলেন চাকরিসূত্রে। সেখান থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাধ্যমতো কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে লন্ডনে বসেই তিনি মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত নাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*। এসময় তিনি বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই অনুসন্ধানের সূত্রে তিনি রংপুর অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের নেতা নূরলউদ্দীনকে আবিষ্কার করেন। এরপর এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজনে লন্ডনস্থ ইন্ডিয়ান অফিসে যোগাযোগ করে পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে তিনি সে-সময়ে রংপুর অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের স্বরূপ, এদেশীয় সামন্তপ্রভুদের অত্যাচারের কাহিনি এবং এসবের বিরুদ্ধে জনৈক কৃষক নেতার আহ্বানে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের

ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হন। ১৭৮৩ সালে সংঘটিত আপাতব্যর্থ সেই কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে নাট্যকার ১৯৭১ সালের সফল মুক্তিযুদ্ধের বীজমন্ত্র খুঁজে পান। এমন কি স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষায় কৃষকনেতা নূরুলউদ্দিনের স্বপ্ন ও সংযমী আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর বিস্ময়কর সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করেন। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের পূর্বে নূরলউদ্দিন চেয়েছিলেন আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কাছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের নিমিত্তে একাধিকবার লিখিত আবেদনও করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রচণ্ড দম্ভভরে সে আবেদন আমলে না নিয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়।

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকটি রচনার সময় নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হককে এই সাযুজ্য দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। এই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> সত্তরের দশকে লন্ডনে প্রবাসকালে আমার ইচ্ছে হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস একটু বিস্তারিত পড়ে দেখব, সেই পড়াশোনা করতে গিয়েই আবার একদিন দেখা পেয়ে যাই এই অসামান্য কৃষকটির। [...] আমি আমার একটি পূর্ব ধারণার সমর্থন পেয়ে যাই যে, বাংলার সাধারণ মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র উনিশশ একাত্তরেই যে গেরিলা হয়েছে তা নয়, এই গেরিলা হয়ে যাবার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, এটা উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেবল লঘুই করে যেতে থাকব। (সৈয়দ শামসুল, ২০১২: ১১৯)

নাটকটি লেখার প্রেরণা হিসেবে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক যে যৎসামান্য উপকরণ হাতে পেয়েছিলেন তা দিয়ে বড়জোর একরৈখিক সরল কাঠামোর নাটক নির্মাণ সম্ভব ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকে একরৈখিক কাঠামো প্রদান করলে কিংবা স্বল্পপরিসরে শিল্পবদ্ধ করলে এর আবেদন ক্ষুণ্ণ হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আর এটি বুঝতে পেরেই লেখক ইতিহাসের পাতা থেকে গৃহীত বাস্তবধর্মী ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতা ও কল্পনার সহযোগ সন্নিপাতে এ-নাট্যকাহিনি নির্মাণ করেছেন।

নাটকটি নাট্যকার এমন একটি অস্থির সময়ে রচনা করেছেন যখন এদেশে একাত্তরের ঘাতক দালালশ্রেণি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পুরো পরিবারকে রাতের অন্ধকারে নৃশংসভাবে হত্যা করার মাধ্যমে মূলত এই অপশক্তি এদেশে অপশাসনের সূত্রপাত ঘটায়। কেননা তারা ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে কখনোই তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না এদেশে। এই কালোশক্তি জাতির এবং তাঁর পুরো পরিবারকে হত্যা করার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি, পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে তারা তৎপর হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদানের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু যাঁর অবস্থান এদেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে দৃঢ়মূল, তাঁকে কখনোই সমূলে বিনাশ করা সম্ভব নয়; বরং স্মৃতির পাতা থেকে বার বার জীবিত হবেন তিনি। আশির দশকে রচিত ও মঞ্চায়িত *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকটির প্রারম্ভে আলোর ঝরনাধারার

মধ্য দিয়ে শহীদ নূরলদীনের পুনরুত্থানের মাধ্যমে বস্তুত দর্শক সেই বিপন্ন রাজনীতি আর অস্থির সময়ে জাতির ত্রাণকর্তা বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন। বস্তুত, 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের টেক্সটের যে বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য তার অন্যতর উদ্ভাসন আমরা দেখি এর মঞ্চায়নে যখন বিস্মৃতি থেকে উঠে এসে কৃষকনেতা নূরলদীন আবার দাঁড়ান জনসম্মুখে [...] বিকৃতির দাপটে পীড়িত সেই সময়ে, সৈয়দ হকের ভাষায়, নষ্ট সময়ে নষ্টবঙ্গে নূরলদীনের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবীভাবেই বঙ্গবন্ধুর পুনর্জাগরণের প্রশ্ন দর্শকমনে দোলায়িত করে দেয়।' (মফিদুল, ২০১৭: ১০৭)

নূরলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকটিতে বঙ্গবন্ধুর ছায়া থাকার বিষয়টি নাট্যকার নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল – আলোচ্য কাব্যনাটক রচনার সময় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর হৃদয়ে কোনো প্রতীকী ভাবনা ছিল কি না, এর উত্তরে তিনি বলেন:

> হ্যাঁ। ওটা তো লেখা হয়ে যাবার পর অনেকেই অনেক রকম এর ভেতরে মাত্রা দেখতে পান। ছায়া দেখতে পান। এটা ঠিকই আছে। আমার মনে পড়ে *নূরলদীনের সারাজীবন* যখন শেখ হাসিনা দেখতে আসেন [...] 'নাগরিক' আমাকে বলেছিল, যে প্রেক্ষাগৃহে শেখ হাসিনার পাশে যদি আপনি বসেন তাহলে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি এর উত্তর দিতে পারবেন। আমি ওঁর পাশে এসে নাটকটি দেখেছিলাম – উনিও দেখছিলেন, নাটকটির কতগুলো জায়গায় এসে দেখি উনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না। এবং আমাকে দুয়েকবার বললেনও যে তাঁর পিতার কথা তাঁর মনে পড়ে। এখন চিন্তা করুন শেখ হাসিনারই মনে হচ্ছে যে, এটা বঙ্গবন্ধুর একটা ছায়া ছিল। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে – [...] মুক্তিযুদ্ধটা হঠাৎ একাত্তরে হয়েছে এমন কিছু নয়। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং ইতিহাসের এই যে ধারাবাহিকতা এটাও কিন্তু আবিষ্কার করার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। *নূরলদীনের সারাজীবন* লেখার সময় এবং সেইসময় বই যখন বেরোয় এর ভূমিকাতে আমি বলেছিলাম যে একাত্তর হঠাৎ করে আসেনি – এই যেমন ধরুন নূরলদীনের সময়কার ইংরেজদের যে রিপোর্ট ইত্যাদি আছে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের। তাতে মি. গুডল্যাড ছিলেন রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর। তিনি নূরলদীন সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিচ্ছেন তাতে লিখছেন – এই লোক পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের একটি বাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং এর সঙ্গে দেশের কৃষক-শ্রমিক-মাঝি- তাঁতি-জেলে, স্কুলের ছাত্র, মক্তবের ছাত্র, মাদ্রাসার ছাত্র অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যুক্ত আছে। আপনি দেখুন, [...] তখন সমগ্র বাংলাদেশের লোক ছিল মাত্র পৌনে তিন কোটি। মানে যেটা আজকের বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা মিলিয়ে যে বৃহৎ বাংলাদেশ। [...] সেই পৌনে তিনকোটি লোকের ভেতর পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের একটি বাহিনী গড়ে তুলেছে আর আজকে যখন আমরা একাত্তর সালে সাড়ে সাত কোটির ভেতরে যখন দেড়লক্ষ দু'লক্ষ লোকের একটা বাহিনী, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা দেখি, তখন দেখা যায় যে এটা নূরলদীনের সময়। এবং তখন যেমন জেলে কামার কুমোর কৃষক ছাত্র জড়িত হয়েছে এবং তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল। একাত্তরেও তাই করেছে। তো এই ধারাবাহিকতা এটা আমাদের ভেতরে আছে। (সৈয়দ শামসুল, ২০১৬: ৬-৭)

স্বরাজ কিংবা স্বাধীনতার জন্য বাঙালি যুগে যুগে লড়াই করেছে, ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত। ভিনদেশি শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে যুগযুগব্যাপী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ব্রিটিশ-বিরোধী সিপাহি বিপ্লব, স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি তাদের হার-না-মানা চরিত্রের প্রমাণ দিয়েছে। বস্তুত নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় বাঙালির এই লড়াইপ্রবণ মানসিকতা নির্মাণে প্রবর্তনা দিয়েছে তাদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যনীতি; অব্যাহত বঞ্চনা, শোষণ-নিপীড়ন। শাসকশ্রেণি বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত করবার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল ধর্মের অপবিধান। বাঙালি যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠায় একাট্টা হয়েছে, তখনই ধর্মের আলখাল্লাধারীদের ব্যবহার করেছে শাসকশ্রেণি, এবং তাদেরকে দাবিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক এই বিষয়টিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য নাটকে। ইতঃপূর্বে *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে মাতবরের উদ্দেশে গ্রামবাসীর মুখ দিয়ে তিনি যেমন বলিয়েছেন: 'বুঝি না আল্লার/কুদরত কারে কয়, কারে কয় বিচার আচার।/যাদের জীবন হইল জন্তুর লাহান/তারে কিছু দ্যাও নাই, দিয়াছো ঈমান;/আর যারে সকলি দিয়াছ, অধিকার/তারেই দিয়াছ তুমি দুনিয়ার ঈমান মাপার – একইভাবে *নূরলদীনের সারাজীবন* নাটকে এই আর্তনাদ ও প্রতিবাদ শোনা গেছে বঞ্চিত কৃষক নেতা নূরলদীনের কণ্ঠে:

> কালা ধলায় একজোটেতে কবচ করে জান,/একজোটেতে গোরা সাহেব, হিন্দু মুসলমান।/তফাৎ করি না দেখিবেন উয়ার মধ্যে ভাই,/যে করিছে শোষণ হামাক শোষণকারী তাঁই।/[...] কালায় কালা, ধলায় ধলা, উপরতলায় এক/উপরতলায় এক জাতি যে খেয়াল করি দ্যাখ।/খেয়াল করি দ্যাখ রে হামার নেঙ্গুটিয়া ভাই,/আরেক জাতি হামার হনু গরীব বলিয়াই। (তৃতীয় দৃশ্য)

বস্তুত শোষকের কোনো জাতি-বর্ণ-ধর্ম নেই। সর্বকালে, সর্বধর্মে, সর্বদেশে শোষকের স্বরূপ একই। আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্যসৃষ্টির প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করে ধর্মাস্ত্র। ১৭৮২ সালের কৃষক-বিদ্রোহ দমনে, কিংবা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করবার জন্যে তারা আওড়েছে ধর্মের চেনাবুলি। হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভস্মসাৎ করা হয়েছে, নারীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়েছে, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু এই নিপীড়িত, শোষিত জনগোষ্ঠীর যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তখনই তাদের মধ্য থেকে উঠে এসেছে একজন মানবিক গুণসম্পন্ন সাহসী নেতা; যার অনিঃশেষ নিষ্ঠা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে মিইয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছে; এবং অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ একটিমাত্র লক্ষ্যে অবিচল থেকে জোটবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৯৭১ সালে জাতির ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যেমন নানা শ্রেণি-পেশার লাখো মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে তেমনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষক-বিদ্রোহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কৃষক নেতা নূরলউদ্দিনের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত দক্ষতায় লাল কোরাসের সংলাপের মাধ্যমে *নূরলদীনের সারাজীবন*

কাব্যনাটকে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপে:

> সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে চাষায় নাঙল ফেলি,/সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে জালুয়া, যোগী, তেলী,/সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে সুতার, কামার, কুমার।/নাঙল ফেলি, বাইশা ফেলি, জাল ফেলিয়া দিয়া,/কেতাব ফেলি, সড়কি লাঠি গুলতি ধরিয়া, যার যা আছে হাতের কাছে তাই না ধরিয়া, গাছের কাঁচা বেল পাড়িয়া ধনুক ধরিয়া/সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে উচ্চারিত এই আহ্বানের সঙ্গে ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের বিষয়গত ও ভাষাগত চমৎকার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। আর এভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে কৃষকদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত কাব্যনাট্যে পরোক্ষভাবে ঘুরে ফিরে আসেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

হতে পারে, *নূরলদীনের সারাজীবন* রচনাকালে সৈয়দ শামসুল হকের অবচেতন মানসলোকে বিরাজ করছিলেন বঙ্গবন্ধু; তাঁর বিশাল অবদান এবং তাঁর নির্মম ও হৃদয়বিদারক মৃত্যুপ্রসঙ্গ। এমনকি নাটকের শেষদিকে বিদ্রোহী নেতা নূরলদীন বাঙালি জাতিকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটি বঙ্গবন্ধুর দেশ ও জাতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অনুরণন। নূরলদীন দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অসীম সাহস নিয়ে প্রশিক্ষিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে, জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন সেই একই কর্তব্যচেতনায় প্রভাবিত ও উদ্দীপিত হয়ে সেই যুদ্ধের সফল ইতি টেনেছেন তারই উত্তরপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির স্বপ্নগুলো সঞ্চারিত হয়েছে। নূরলদীনের স্বপ্ন প্রকৃত অর্থে আবহমান বাঙালির যূথবদ্ধ স্বপ্ন। একারণে নূরলদীন অতীত হয়েও বর্তমান; মৃত থেকেও বেঁচে আছেন কোটি বাঙালির অন্তঃসত্তায়:

> দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/আবার বাংলার বুকে জোয়ারের পলি পড়িতেছে।/দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/আবার নাঙল ঠেলি মাঠে চাষী বীজ বুনিতেছে।/দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/নবান্নের পিঠার সুঘ্রাণে দ্যাশ ভরি উঠিতেছে।/[...] দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/[...] সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে। (ত্রয়োদশ দৃশ্য)

এই সোনাঝরা বাংলায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এসে এদেশের সাধারণ নিরীহ জনগোষ্ঠীকে শাসন-শোষণ করেছে এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশরা নানান প্রক্রিয়ায় লাখ লাখ টাকার সম্পদ ও মূল্যবান বস্তু পাচার করেছে ইংল্যান্ডে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা যখন এদেশে প্রথম আসে তখন তারা ছিল কপর্দকশূন্য, কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তারা নিয়ে গেছে বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ। ইংল্যান্ডে ‘চতুর্থ পার্লামেন্টারি রিপোর্ট-১৭৭৩’-এ প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায় – ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দ্বারা নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের যে

তালিকা প্রস্তুত করে তাতে দেখা গেছে ১৭৫৭ হতে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট ৬০ লাখ পাউন্ড, অর্থাৎ নয় কোটি টাকা শুধুমাত্র উৎকোচ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। (*প্রথম আলো*, ২০১১: ফিচার – 'অন্য আলো') একইভাবে পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অন্যায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করেছে। এর ফলে এদেশের বুকে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা। আর তার অনিবার্য ফলস্বরূপ এদেশে নেমে এসেছে ভয়াল দুর্ভিক্ষ। এ কারণে মুক্তিকামী নেতাদের দেশ ও জাতিকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম স্বপ্ন 'দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ/সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশেই আছে।'

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে দেয়া বাঙালির প্রাণের ছয় দফার মধ্যেও এ দাবিটি সন্নিবেশিত ছিল। ছয় দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি দফাই ছিল অর্থনৈতিক সমবণ্টনের। ঐতিহাসিক ছয় দফার তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর দফায় বলা হয়েছে:

> ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রাব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সংবলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।
>
> ৪. সব রকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।
>
> ৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে। (প্রীতিকুমার, ২০০২: ১৩৪)

বস্তুত, সৈয়দ শামসুল হকের চেতনায় এবং মননে বাংলাদেশের লোকপ্রিয় একজন গণনায়ক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরঞ্জীব ছিলেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যখন এদেশে সামরিক শাসকের কালাকানুনের কারণে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা সাধারণ জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল, তখন সৈয়দ শামসুল হক রংপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঘটনা ও 'চরিত্রকে মঞ্চের কেন্দ্রে স্থাপন করে *নূরলদীনের সারাজীবন* লিখলেন, তার মধ্যে দূর অতীতের অপরিহার্য উপাদান থাকলেও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তাতে নিকট অতীতের বঙ্গবন্ধুকে প্রতীকী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার সংকেত শনাক্ত করা দুরূহ নয়।' (শফি, ২০১৬: ১৮) কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক আবার আলোচ্য নাটকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর

উপস্থিতির কথা স্বীকার করে নেননি। যেমন, সৈয়দ শামসুল হকের বন্ধু ও নাট্যজন আতাউর রহমান বলেছেন:

> আমি মনে করি নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে হক ভাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি এনেছেন পরোক্ষভাবে; বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি নয়। কোনো দর্শক যদি মনে করেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা প্রধান, তাহলে সেই দর্শক হয়তো নূরলদীনের সারাজীবন-এ বঙ্গবন্ধুর ছায়া খুঁজে পাবেন। (আতাউর, ২০১৬: ১৮)

৩

বস্তুত, কৃষিই আমাদের সমাজের স্থিতিশীল জীবিকার আদি উৎস এবং কৃষির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে মানবসভ্যতা। বিশ্বের প্রাচীন ও বৃহত্তর তিনটি সভ্যতা মিশর, চীন এবং ভারতের অগ্রগতির মূল কারণ ছিল, কৃষির বিপ্লবাত্মক উন্নয়ন। কিন্তু ইউরোপীয় বেনিয়ারা বারবার এই কৃষিব্যবস্থার ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করে, কৃষিজাত সম্পদ লুণ্ঠন করে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছে। এর ফলে এদেশের কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। রংপুর অঞ্চলে কৃষকদের ওপর অযাচিত কর আরোপ করেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তা সুদে আসলে আদায় করেন দেওয়ান দেবী সিং। মূলত দেবী সিংয়ের অত্যাচার ও নির্মমতায় অতিষ্ঠ হয়েই রংপুরের কৃষকগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ-বিদ্রোহ ১৭৮৩ সালের ‘রংপুর বিদ্রোহ’ নামে উল্লেখিত হয়েছে। দেবী সিং ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার। তিনি ছিলেন কুটিল, নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ। দেবী সিংয়ের অবর্ণনীয় নৃশংসতায় রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়াসহ আশপাশের এলাকা পরিণত হয়েছিল জনহীন শ্মশানক্ষেত্রে। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের (২০১২: ১০৬) মতে: ‘কোম্পানির বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভের পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে যে অবর্ণনীয় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ ছিল দেবী সিংহের লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন।’

যখন ধীরে ধীরে এ অঞ্চল পরিণত হচ্ছিল মৃত্যুকূপে, নগণ্য সম্পদটুকু, সামান্য বসতবাড়িটুকু এমনকি সন্তানের মুখের সামান্য আহারটুকুও দেবী সিং ও তার দলবল কেড়ে নিয়েছিল, নির্যাতিত ও নিঃস্ব এসব মানুষের যখন আর কিছুই হারাবার ছিল না তখনই তারা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে শিরদাঁড়া ঋজু করে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করতে হয়েছে ইংরেজদের এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তারা পিছু হটেনি। কৃষকদের এই আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুগপুরুষ নূরলদীন। ‘খনির ঘন অন্ধকার থেকে যেমন করে উঠে আসে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড, তেমনি সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে উঠে আসেন এক অসামান্য মানুষ, একজন অমিতবিক্রমশালী সিংহহৃদয় পুরুষ। নিপীড়িত জনগণকে সংবদ্ধ করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে প্রবল তেজে রুখে দাঁড়ান তিনি।’ (ফরিদ, ২০১৫)

লক্ষণীয় যে, ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের জীবন ও জনপদ বিষয়ক গ্রন্থরচনায় এদেশীয় ইতিহাসবেত্তাগণ বিস্ময়কর নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসের পরিবর্তে তারা বরং প্রাচীন মুনি ঋষিদের কাহিনি বর্ণনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন; পুরাণকাহিনি

বর্ণনায় উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। প্রাক-ব্রিটিশপর্বে, অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলেও যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন তাদের লেখনীর বিষয়বস্তু রাজরাজড়ার তোয়াজ-তোষামোদের মধ্যেই সীমিত থেকেছে; সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখময় বাস্তব জীবনকে তারা গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদের পূজারি ইতিহাসবেত্তাগণ ব্রিটিশ শাসনের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে প্রকৃত সত্য বিকৃত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই অনেকটা বিকৃত করে ফেলেছেন। ব্রিটিশদের শোষণের কথা নয়, বরং সুশাসনের কথাই তারা সাড়ম্বরে বলেছেন। ফলে এদেশের মানুষের যুগযুগব্যাপী বঞ্চনা ও সংগ্রামের ইতিহাস অনেকটাই অপ্রকাশিত থেকে গেছে। হয়তো এ কারণেই রংপুরের কৃষকবিদ্রোহের নেতা নূরদ্দীনের বিশদ পরিচয় ইতিহাসের পাতায় তেমনটা নেই। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম* গ্রন্থের 'রংপুর বিদ্রোহ' পরিচ্ছেদে এই বীরের সামান্য কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর অসামান্য ধীশক্তি ও কল্পনাসহযোগে এই সামান্যসূত্রের আশ্রয়ে রচনা করেছেন অসামান্য কাব্যনাটক *নূরলদীনের সারাজীবন*। বলা বাহুল্য, এদেশের মানুষের কাছে ইতিহাসের এই মহানবীরকে তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এদেশের আপামর জনসাধারণ সুপ্রকাশ রায়ের নূরউদ্দীনকে না চিনলেও সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনকে চেনেন; জানেন তার অসামান্য উদাত্ত আহবান – 'জাগো বাহে কোনঠে সবায়'।

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থে দেবী সিং সম্পর্কে যেসমস্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন তিনি সেগুলো পেয়েছেন আরেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের তথ্যানুসারে অত্যাচারী দেবী সিং ছিলেন পশ্চিম-ভারতের পানিপথের নিকটবর্তী এক গ্রামের বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি ভাগ্যান্বেষণে প্রথম মুর্শিদাবাদে আসেন। মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে দেবার লোভ দেখিয়ে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার হন তিনি। এ অঞ্চলে পূর্বে যেখানে বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হতো, দেবী সিং সেখানে রেজা খাঁর সঙ্গে বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা খাজনা আদায়ের চুক্তি করেন। রেজা খাঁ ইতঃপূর্বে যেখানে নয় লক্ষ টাকার স্থানে ছয় লক্ষ টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হতেন, দেবী সিং ইজারাদার হয়েই বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকাসহ ব্যাক্তিগত খাতে আরো বাড়তি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ প্রজাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। তাঁর এই অমানুষিক অত্যাচারে টিকতে না পেরে প্রজারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়, এবং অচিরেই ব্রিটিশ বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে, এবং তৎকালীন গভর্নর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদেশে দেবী সিংকে ১৭৭২ সালে ইজারাদারের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সুচতুর দেবী সিং অর্থলোভী ওয়ারেন হেস্টিংসকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ দিয়ে সে যাত্রায় বেঁচে যান, এবং পূর্বের মতোই প্রজাদের ওপর তীব্র অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে সেসব অঞ্চলে পুনর্বার তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে হেস্টিংস আবারো মোটা অঙ্কের উৎকোচ নিয়ে দেবী সিংকে মুর্শিদাবাদ-পূর্ণিয়ার ইজারাদারের পদ থেকে সরিয়ে মাসিক একহাজার টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করে রংপুর অঞ্চলে প্রেরণ করেন।

এই পর্যায়ে ধূর্ত দেবী সিং অতিদ্রুত দেওয়ানি পদের পাশাপাশি দিনাজপুর, রংপুর ও এদ্রাকপুর পরগনার ইজারা বন্দোবস্ত করে নেন এবং পুরানো রূপে ফিরে গিয়ে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে পৈশাচিক অত্যাচার শুরু করেন। সাধারণ জনগণের উপর এসব অত্যাচারের ক্ষেত্রে দেবী সিংহের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল হররাম নামক নিষ্ঠুর, পাষাণ প্রকৃতির এক ব্যক্তি। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তাঁর *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী* নামক গ্রন্থে দেবী সিংহের সহকারী হররামের নির্যাতন প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> দেবী সিংহ ইজারা লইয়া জমিদার ও প্রজা উভয়ের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। হররাম নামে এক পিশাচ প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া, দেশমধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিল না। এরূপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখনও দেখে নাই, বা কেহ কখনও শুনে নাই। (নিখিলনাথ, ২০১৮: ৩২১)

উল্লেখ্য, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর কাব্যনাট্যে হরেরাম নামক এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও তাকে ইতিহাসের সত্যানুসারে দেবী সিংহের লোক না দেখিয়ে বরং নূরলদীনের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রকাশে নূরলদীনের লোক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

শুধু সাধারণ কৃষকই নন, অনেক ভূস্বামী, সম্ভ্রান্ত জমিদারও দেবী সিংয়ের অতিরিক্ত খাজনা আর নানাপ্রকার নিয়মবহির্ভূত নীতির শিকার হয়ে তাদের জমিদারি হারাতে থাকে। এসব জমিদারি নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন ধূর্ত দেবী সিং এবং কৃষকদের ওপর বাড়িয়ে দেন অত্যাচারের মাত্রা। ফলে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে ওঠে। রংপুর অঞ্চলের নিরীহ ভুক্তভোগী চাষিদের করুণ অবস্থার চিত্র স্বয়ং দেবী সিং একটি পত্রে উল্লেখ করেন এভাবে:

> ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রঙ্গপুর প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যেই ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পত্তি পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতি কষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়, এইজন্য দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক কাল-কবলে পতিত হইতেছে। দুটি একটি মৃৎপাত্র ও একখানি পর্ণকুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল; ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। (নিখিলনাথ, ২০১৮: ৩২২)

দেবী সিংয়ের পাশাপাশি এসময় সুযোগসন্ধানী মহাজন শ্রেণিও তৎপর হয়ে ওঠে। সাধারণ চাষিরা যখন দেবী সিংয়ের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতির জন্য মহাজনদের দ্বারস্থ হয়েছে, তখন তারা কড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে কৃষকদের ওপর নতুন করে আর্থিক চাপ তৈরি করতে শুরু করেছে। ফলে একদিকে অনাদায়ী খাজনার কারণে কৃষকশ্রেণি দলে দলে কারাগারে বন্দিদশা ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছে, অন্যদিকে মহাজন শ্রেণি এই সুযোগে অবৈধ উপায়ে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষ্যে এই নির্মম ঘটনার চিত্র নিম্নরূপ:

> এই সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে কতকগুলি রাক্ষস প্রকৃতির কুসীদজীবী বাস করিতেছিল মহাকবি সেক্সপীয়রের বর্ণিত শাইলকও তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। [...] শুনিলে হৃদকম্প উপস্থিত হয় যে, সেই সমস্ত কুসীদজীবী বিপন্ন কৃষকদিগের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ আদায় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল!!! একদিকে দেবী সিংহের, অন্যদিকে কুসীদজীবিগণের ভীষণ অত্যাচারে সেই নিরীহ প্রজাগণ প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধমুখে ভগবানকে আহ্বান করিত; [...] তাহাদের কঠোর পরিশ্রমোৎপাদিত শস্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের সংবৎসরের আহার্য সম্পত্তি অপহৃত হইল, অথচ তাহাদের ঋণপরিশোধের বিশেষ কোন সুবিধাও হইল না!! অবশেষে তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই, বিদা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। এইরূপে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ শস্যোৎপাদনের পথও একেবারে নিরুদ্ধ হইল। তাহার পর, তাহাদিগের জীর্ণ পর্ণকুটীর লুণ্ঠন করিয়া, দেবীসিংহের অনুচরগণ সেই সকল কুটীর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। [...] এতদিন যাহারা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করে নাই, এক্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল! [...] অনাহারে রঙ্গপুরবাসী প্রজাগণের মধ্যে ঘোর কষ্ট দেখা দিল; পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থসংসার হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। [...] এককথায় সমস্ত উত্তরবঙ্গ জনমানবহীন হইয়া শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। (নিখিলনাথ, ২০১৮: ৩২৩-৩২৭)

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকটিতেও নূরলদীনের জবানিতে এই নির্মম অত্যাচারের বিপরীতে নিরীহ ও নিঃসহায় কৃষকের করুণ অবস্থা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। কৃষক নেতা নূরলদীন কোম্পানির প্রতিনিধি মরিসকে উদ্দেশ্য করে বলেছে:

> আর একদিন, আল্লার সেই একদিন দেখিলোম তোমার বন্ধু/দেবী সিং, খাড়া হয়া আছে হামার বাড়ির বগলে।/জন্মে যা শোনো নাই, চৌগুণা খাজনা চায়/আবড় ড্যাবড় নগদে চায়, বাটা চায় টাকায় আট আনা,/দিবার না পারিলে সব লুটি নিয়া যায়।/অগ্নি দিয়া যায়, হাহাকার করি উঠিলোম সকলে।/ [...] একদিন টাকায় টাকা সুদ স্বীকার করি মহাজনের ঘরেতে গেইলোম/কর্জ শোধ করিবার না পাই বলিয়া জমি লিখিয়া দিলোম,/ঘটি বাটি লাঙল বলদ মই বিক্রি করিলোম,/বাপ হয়া বিক্রি করিলোম ব্যাটা, স্বামী হয়া ইস্তিরি,/যুবতী কন্যা নিলো কাড়ি/জংগলে পলেয়া গেইলোম, গোরস্তান শ্মশান হয়া গেইল/হামার বাপোদাদার বাড়ি/হামার নিজের ভিটা, নিজের মাটি চলি গেইল শয়তানের দখলে। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

আবার, দেবী সিংয়ের সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধিদের যে সম্পর্ক, বিশেষত গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করার ঐতিহাসিক সত্যটিকে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক নিপুণ বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন আলোচ্য কাব্যনাটকে। রংপুরে সদ্য আগত রেভিনিউ সুপারভাইজার মরিসের সঙ্গে দেবী সিং প্রসঙ্গে কোম্পানির

কালেক্টর গুডল্যাডের কথোপকথন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য। মরিসের উক্তি:

> মহামান্য কালেকটর, আপনার অভিজ্ঞতা আমার নির্ভর।/মাত্র তিনদিন আগে, দেবী সিং এসেছিল আমার কুঠিতে,/কিঞ্চিৎ ব্যাপারে, গুরুতর কিছু নয়/মোটামুটি আমার কুশল আর সাফল্য কামনা।/সেই সঙ্গে একপ্রস্থ মসলিন, আর কিছু সোনা। [...] আমার তো মনে হয়, দেবী সিংও ব্যতিক্রম নয়।/বড় জোর স্বার্থেই সে আছে সঙ্গে, তার বেশি নয়। (পঞ্চম দৃশ্য)

গুডল্যাডের উক্তি:

> ওতে দোষ নেই।/কোম্পানির ক্ষতি নেই। [...] ডিয়ার মরিস, কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,/স্বার্থ আছে আমাদেরও। – নির্ধারিত রাজস্ব আদায়।/কোম্পানীর কুঠির ফ্যাকটর,/ [...] স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে, মিত্র হয়ে যায় পরম শত্রুও।/স্বার্থেই সে আমাদের লোক।/ তাছাড়া, নিশ্চয় তুমি জানো, অন'বল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার বড় প্রিয়পাত্র এই দেবী সিং – এবং আমারও। ক্রমে ক্রমে তোমারও সে হবে। নেটিভের চোখ ও জিহ্বার চেয়ে আমাদের কাছে/ বরং আকর্ষণীয়, হাত, তার হাত।/বরং এ লক্ষণীয়, সেই হাত দেয় কি না দেয়,/দেয় যদি কতখানি দেয়, তোমাকে বা দেয় কতখানি। (পঞ্চম দৃশ্য)

বস্তুত দেবী সিং এবং কোম্পানির প্রতিনিধিবর্গ পরস্পরের স্বার্থরক্ষায় একযোগে অত্যাচার চালিয়েছে এদেশের সাধারণ জনগণের ওপর। দেবী সিং নিজে যখন নির্মম অত্যাচার চালিয়েও প্রজাদের কাছ থেকে আশানুযায়ী খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে, তখন একের পর এক কর্মচারী বদল করে অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর কর্মচারী নিয়োগ করেছে। দেবী সিংয়ের আপন ভ্রাতা বাহাদুর সিং এবং আরেক স্বদেশীয় পাষণ্ড হরেরাম যুগপৎ অত্যাচার চালিয়ে মূল খাজনার অতিরিক্ত কর ও বাটার জন্য কৃষকদের নিকট থেকে প্রতি টাকায় আট আনা পর্যন্ত সুদ আদায় করেছে পৈশাচিক উল্লাসে। মূলত ইংরেজ বেনিয়াদের অত্যাচারের চেয়েও ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক ছিল স্বদেশীয় জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার ও আচরণ। যুগে যুগে ভিন্ন নামে ও পরিচয়ে এ-স্বদেশদ্রোহী মনুষ্যনামধারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে এবং বিদেশিদের স্বার্থ-সংরক্ষণে চরম সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বদেশ-স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মীরজাফর-জগৎশেঠ, ১৭৮৩ সালে দেবী সিং, ১৯৭১ সালে রাজাকার-আলবদর-আলশামস নামের দেশদ্রোহী নানান সংগঠন। অনৈতিক ক্ষমতা আর অর্থলোভ এদের মনুষ্যত্বহীন পাষণ্ডে পরিণত করেছে। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্যের নায়ক নূরলদীনও এই স্বজাতিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে তীব্র বিষোদগার করেছেন:

> গোরা নয়,/কারণ গোরার কামান বন্দুক আছে,/তাঁই কিছু নয়,/তারো চেয়ে বড় অস্ত্র আছে,/আছে তার হাতিয়ার/মহাজন জমিদার।/গোরার কি শক্তি আছে/যদি তার সঙ্গে নাই থাকে এই দেশীয় শুয়ার? (ত্রয়োদশ দৃশ্য)

রংপুর, দিনাজপুর এবং এদ্রাকপুরের ইজারাদার দেবী সিং ও দলবল কর্তৃক অবর্ণনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে এ অঞ্চলের সকল কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজেদের আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে কৃষক নেতা নূরলদীনের নেতৃত্বে ১৭৮৩ সালব্যাপী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গোপন সভা সমাবেশে মিলিত হয়ে আসন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে। প্রথম দিকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে দেবী সিংয়ের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকার করা। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন:

> রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাহাদের দাবী সম্বন্ধে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়া এই দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কালেক্টর দাবী পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না। ইহার পর কৃষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা কালেক্টরকে জানাইয়া দিল, তাহারা আর খাজনা দিবে না এবং এই শাসন মানিয়া চলিতেও প্রস্তুত নহে। (সুপ্রকাশ, ২০১২: ১০৯)

ইতিহাসের এই সত্য ঘটনাটিকে সৈয়দ শামসুল হকও তাঁর আলোচ্য কাব্যনাটকে উপস্থাপন করেছেন। কাব্যনাটকটির ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায়, কৃষকনেতা নূরলদীন, তার বন্ধু ও সহচর আব্বাস এবং এলাকার শোষিত কৃষককুল মিলিত হয়ে টমসনের কুঠির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রংপুরের কালেক্টরের নিকট আর্জি জানাতে এসেছে। এখানেই নূরলদীনের বক্তব্যে জানা যায়, ইতঃপূর্বে আরো কয়েকবার তারা দেবী সিংয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি প্রজাদের স্বার্থরক্ষা না করে বরং তাদের নিয়োজিত ইজারাদার দেবী সিংয়ের পক্ষাবলম্বন করেছে এবং এতদ্বিষয়ে নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছে। নূরলদীন ও তাবৎ সাধারণ কৃষক ইংরেজ বেনিয়াকে তাই শেষবারের মতো সাবধান করে বলেছে :

> একদিন অনেক যুক্তি করি ভাবি চিন্তি সকলের তরফে মুঁই/এক দরখাস্ত করিলোম ভদ্রমতে/কোম্পানীর ঘরে, কোম্পানীর কালেকটর তোমার মারফতে।/উয়াতে কইলোম, সহ্যের অতীত হয়া গেইছে হামার হাল,/আর সহ্য না হয় কোনোমতে।/লিখিলোম, ইয়ার প্রতিকার তোমরা নিশ্চয় করিবেন,/জরুরী জানিয়া এই এলাকা হতে দেবী সিংকে তুলিয়া নিবেন, আর জমিদারের চাবুক কাড়ি নিবেন,/আর কাড়িয়া নিবেন মহাজনের ঘরে হামার সুদের উপর সুদ লিখিবার খাতা।/[...] তোমরা এই করিবেন নিশ্চয় আর/যা করিবেন করিবেন এই মাসের ভিতরে,/যদি এই মাস পার হয়া যায়, তবে হামরা কোনো দোষী নই,/হামার এই দুই হাত যা করে। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

কিন্তু তাদের এই আর্জি যখন কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমলে নেননি তখন এলাকার অত্যাচারিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে নূরলদীন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছে

> আর কোন বিচার কি প্রতিকার/না চাই তোমার।/[...] হামার দ্যাশে হামার অধিকার।/ মজুর কিষাণ জালুয়া যোগী আছে হামার সাথে।/এবার হতে বিচার আচার আইন হামার হাতে। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

নূরলদীনের এই উদাত্ত আহ্বানে উদ্দীপ্ত হয়ে কৃষকশ্রেণি সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে:

> কুঠিয়াল, হেই সাৰোধান।/দেবী সিং, হেই সাবোধান।/জমিদার, হেই সাবোধান।/মহাজন হেই সাবোধান। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এই পর্যায়ে সাধারণ কৃষক নূরলদীনকে 'নবাব'রূপে স্বীকৃতি দেয়। নূরলদীনও অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দয়াশীল নামক এক প্রবীণ বিচক্ষণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এছাড়াও এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তিনি এতদঞ্চলের সমুদয় কৃষককে অত্যাচারী দেবী সিংকে খাজনা না দিয়ে বরং বিদ্রোহের ব্যয় মিটানোর জন্য চাঁদা দিতে বলেন। সাধারণ কৃষক প্রদত্ত এই 'চাঁদা' ইতিহাসে 'ডিং খরচা' নামে পরিচিত ছিল। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিল এটি। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে শাসককুল এ-পর্যায়েও প্রজাসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এসকলের ঊর্ধ্বে উঠে নূরলদীন সকল নির্যাতিত কৃষককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছে:

> আব্বাস-ভবানী-গরীবুল্লা-হরেরাম/কাঁই সঙ্গে শুনিবে হামার?/কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার?/মজিবর নেয়ামত-নূরল ইসলাম-/বিপিন-অযোধ্যা-শম্ভু হায়দার/এ নিশীথে কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার? (অষ্টম দৃশ্য)

ধর্মের বিভেদ ভুলে সাধারণের জন্য লড়াই করেছেন নূরলদীন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আরোপ করেননি। আর এ কারণেই তিনি হতে পেরেছেন গণমানুষের প্রাণের নেতা। ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বঙ্গবন্ধুকে নূরলদীনেরই উত্তরসূরি মনে হবে। কেননা যেখানে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের ধুয়ো তুলে এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, সেখানে বঙ্গবন্ধু শিখিয়েছেন বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলিম, বাংলার খ্রিস্টান, সবাই বাঙালি। নূরলদীনের এই অসম্প্রদায়িক চেতনায় রেভেনিউ সুপারভাইজার মরিস বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন:

> আমি এই লোকটিকে বুঝতে পারি না।/নিজে সে মুসলমান, অথচ মুসলমান তার হাতে নিহত হয়েছে/ঠিক হিন্দুর মতোই, একই হারে, কখনো বা একই হামলায়।/হিন্দু নয়, মুসলমান সে,/যে মুসলমান মন্দির প্রতিমা ধ্বংস পুণ্য বলে মনে করে জানি/অথচ হিন্দুরা এই লোকটিকে, একজন মুসলমানকে/দেবতার মতো পূজা করে। (নবম দৃশ্য)

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে সমগ্র রংপুর অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ তুমুল আকার ধারণ করে। ফলে একদিকে যেমন রংপুর অঞ্চলে দেবী সিংয়ের সকল কর্মচারী এলাকা ত্যাগে বাধ্য হয়, তেমনি পার্শ্ববর্তী কোচবিহার, দিনাজপুরের কৃষকগণও নূরলদীনের বাহিনীতে যোগ দিয়ে একযোগে নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব গোমস্তাদের বিতাড়িত করে; এবং এ-বিদ্রোহে যে বাধা দিয়েছে, কৃষকগণ তাকেই হত্যা করেছে। এভাবে দেবী সিংয়ের বহু কর্মচারীর সঙ্গে এলাকার অনেক মহাজন জমিদার কৃষকদের হাতে নিহত হয়েছে।

ঐতিহাসিক খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আমেদ তাঁর *কোচবিহারের ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন:

> ইহার পর কাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কাজিরহাট এবং টেপা পরগণায় বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া কর সংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্রতত্র বধ করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহীগণকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারও জীবনান্ত ঘটে। (সুপ্রকাশ, ২০১২: ১১০)

সৈয়দ শামসুল হক ইতিহাসের এই সত্য ঘটনাটিকে তাঁর কাব্যনাটকেও উল্লেখ করেছেন কিছুটা পরোক্ষভাবে। এখানে ডিমলার জমিদারের সঙ্গে সরাসরি কৃষকদের যুদ্ধদৃশ্য না দেখিয়ে নূরলদীনের স্ত্রী আম্বিয়া এবং সহচর আব্বাসের পারস্পরিক কথোপকথনে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। আম্বিয়া যখন উদ্বিগ্ন হয়ে আব্বাসকে জানায় নূরলদীন ছয়দিন ধরে ঘরছাড়া, তখন আব্বাস তাকে জানায়:

> ডিমলার দিকে কিছু গণ্ডোগোল। ডিমলার জমিদার/মোহন চৌধুরী নিজে সেনাপতি সাজিয়া এবার/তার এলাকার/বেদখল গ্রাম গঞ্জ করিবে উদ্ধার।/অনেক মানুষ ধরি আগায় চৌধুরী।/জয় যদি হয় তার, তবে আছে আর যত চৌধুরী,/মনোতে সাহস ফিরি পাইবে আবার।/সুতরাং পয়লায় চৌধুরীকে ঝাড়ে বংশে নাশ করিবার দরকার, দরকার/বুঝি সর্বশক্তি ধরিয়া নূরলদীন ডিমলার দিকে যায়, ছয়দিন আগে।/বৃক্ষ যদি বড় হয়, শিকড় তুলিতে তার সময় তো লাগে?/বোঝেন নিশ্চয়। (দশম দৃশ্য)

অন্যত্র আম্বিয়ার কণ্ঠে গীত লোকায়ত গানে উঠে এসেছে ডিমলার জমিদারের সঙ্গে সাধারণ কৃষকদের সম্মুখযুদ্ধ প্রসঙ্গ:

> মোর পতিধন জংগতে যায় ডিমলা শহরে,/ [...] ডিমলাতে হে আছে রাজা গৌরমোহন চৌধুরী,/কিষান কারিগরের গলায় মারিল তাঁই ছুরি, বাড়ি নিল নারী নিল গস্ত করিয়া।/উয়ার গলা কাটিম এলা ঘচাং করিয়া –/ওকি ঘেচ্চাং কি ঘচ্চাং করিয়া।/রাজার বাড়ি শক্ত বাড়ি রাজায় গড়িছে।/কিষাণ সেনা আশেপাশে গত্তো করিছে।/গত্তো করি আগুন দিল বারুদ ঠাসিয়া,/ধ্বসিয়া পড়ে রাজার বাড়ি হিড়িম করিয়া – (দশম দৃশ্য)

আবার নূরলদীনকে ‘নবাব’ ঘোষণা করে আশপাশের নির্যাতিত কৃষকদের নূরলদীনের দলে সমবেত হওয়ার ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাও আলোচ্য নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। বাস্তবে নূরলদীনের দেওয়ান ছিল প্রবীণ কৃষক দয়াশীল। নাট্যকার আলোচ্য নাটকেও তাকে নূরলদীনের দেওয়ানরূপেই উপস্থাপন করেছেন। অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া অন্য এলাকার কৃষকরা যখন শুনেছে ডিমলার যুদ্ধে নূরলদীন ও তার কৃষকবাহিনী জয়ী হয়েছে, তখন অবশিষ্ট কৃষকদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে প্রভূত সাহস; এবং তারা নূরলদীনের শক্তি বাড়াতে দলে দলে রংপুরে সমবেত হয়েছে। দ্বাদশ দৃশ্যের একটি মঞ্চনির্দেশনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আবার, নূরলদীনের দেওয়ান দয়াশীলের সঙ্গে অন্য এলাকা থেকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে আগত কৃষকদের কথোপকথনে এই বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে:

> ইংরাজ হতে মুক্তি চাই/দেবী সিং হতে রক্ষা চাই/[...] দিনাজপুর হতে – দিনাজপুর।/আসিলোম এই দ্যাশে/নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে। [...] /ক্ষুধার প্যাটে অন্ন চাই/উদাম দেহে বস্ত্র চাই/অন্ন চাই বস্ত্র চাই/ [...] কুচবিহার হতে কুচবিহার। আসিলোম এই দ্যাশে/নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে। (দ্বাদশ দৃশ্য)

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, কৃষকদের এই সম্মিলিত আক্রমণে দেবী সিং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডের শরণাপন্ন হন। যেহেতু দেবী সিংয়ের অবৈধ উপার্জনের একটা বড় অংশ উৎকোচ হিসেবে গুডল্যাড ভোগ করত, তাই দেবী সিংকে কৃষক-আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য রংপুর অঞ্চলে অবিলম্বে কয়েকটি দলে সিপাহিদের প্রেরণ করেন; এবং এই বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড। নিষ্ঠুর ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী যাত্রাপথে এসময়ে সম্মুখে যাকে পেয়েছে তাকেই নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করে তারা নূরলদীন ও তার বাহিনীর সন্ধানে অগ্রসর হতে থাকে। এদিকে মোগলহাট নামক স্থানে ক্ষুব্ধ কৃষকরা নূরলদীনের নেতৃত্বে দেবী সিং এবং ম্যাকডোনাল্ডের বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। কিন্তু প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর নিকট সাদামাটা লাঠিয়াল কৃষক বাহিনী টিকতে না পেরে অসহায়ভাবে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে নূরলদীন বীর বিক্রমে লড়াই করেন, এবং আহত হয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দি হন। অন্যদিকে তাঁর দেওয়ান দয়াশীল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারান। নূরলদীনও শত্রুশিবিরে ক্রমাগত নির্যাতিত হয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর ১৭৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাটগ্রামে আর একটি বিশাল বিদ্রোহী কৃষকবাহিনীকে ম্যাকডোনাল্ড ও তার বাহিনী সম্মুখ সমরে পরাজিত করে। এবং এই যুদ্ধের পর কৃষক বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাটগ্রামের যুদ্ধে কৃষকবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের পরপরই শুরু হয় কৃষকদের ওপর ইংরেজ বাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচার, নৃশংস তাণ্ডব। মোগলহাটের যুদ্ধ ও নূরলদীনের এই পরাজয় নিয়ে গুডল্যাড তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন:

> In an attempt to burn Mughalhat, the self-styled Nawab's forces were defeated, and the Nawab himself wounded and taken prisoner. A party of sepoys under Lieutenant Macdonald marched to the north against the principal body of insurgents and a decisive engagement was fought near Patgram on the 22nd February 1783. The sepoys disguised themselves by wearing white clothes over their uniform and by that means got close to the rebels, who were utterly defeated; sixty were left dead on the field, and many others were wounded and taken prisoners. (ফরিদ, ২০১৫)

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নাটকের কাহিনিতে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে এই যুদ্ধের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত শিল্পকুশলতায়:

> দস্যু নূরলদীনে দ্যাখো আশেপাশেই আছে -/ [...] সে ঠাঁয় দ্যাখো জনমানুষের শতেক ঘর আছে।/ঘরগুলাতে আগুন দিলোম সটকি পড়ে পাছে/আংগরা করি দিলোম

> তবু মানুষ মরে নাই।/ [...] জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন আনেন উয়ার লাশ।/ [...] পশ্চিমেতে ফাঁসী দিলোম মানুষ ধরি গাছে।/চৌমাথাতে শতে শতে কিষান ঝুলি আছে।/শ্মশান করি দিলোম তবু আওয়াজ ক্যানে পাই?/ [...] কাঁই কইলে কাঁই কইলে দক্ষিণেতে আছে?/ডিং খরচা নূরলদীনে সে ঠাঁয় তুলিয়াছে। দক্ষিণেতে বন্ধ করি দিলোম খেওয়াঘাট।/ভাত বন্ধ করি দিলোম বন্ধ বাজারহাট। [...] দস্যুরা এখানে আছে, এই পাটগ্রামে। (নবম দৃশ্য)

অন্য একটি পরিচ্ছেদেও নীলকোরাসের ঘোষণার মাধ্যমে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তার এদেশীয় দোসরদের সাধারণ জনগণের প্রতি সীমাহীন শোষণ-অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির আন্দোলনকে তারা নাম দিয়েছে দস্যুতা। এবং এদের গ্রেফতারের জন্য তারা জনমনে তৈরি করেছে বিভ্রান্তি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও ঠিক এমনটা দেখা গিয়েছিল। শাসক পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে বানিয়েছিল ভারতের দালাল, আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নিকট ছিল দস্যু ও দেশদ্রোহী। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে তারাও ধর্মকে ব্যবহার করে নানান ভুলতথ্য প্রচার করেছিল; যার প্রমাণ রয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাটক *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর কাহিনিতে। *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাটকেও রয়েছে কৃষকদের সম্পর্কে কোম্পানির বিভ্রান্তিমূলক সম্প্রচার এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচারের প্রতিচিত্র:

> এই এলানদ্বারা তামাম সুবা বাঙালার প্রজাবৃন্দকে জানানো যাইতেছে,/কোম্পানী বাহাদুরের অশেষ যত্ন এবং সুচারু ব্যবস্থা সত্ত্বেও/কতিপয় দুর্বিনীত ব্যক্তি এখন পর্যন্ত সমাজের অভ্যন্তরে রহিয়া গিয়াছে, ইহারা অশেষ প্রকার দুষ্কৃত সাধনে তৎপর রহিয়াছে,/পরগণায় পরগণায় লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতেছে,/সরলমনা কৃষক ও কারিগরদিগকে আপন আপন কর্ম করিতে বাধা দিতেছে, নানা মিথ্যা বাক্যে তাহারা প্রজাবৃন্দকে দস্যুদলে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করিতেছে।/ [...] এই দস্যুদিগের হাত হইতে প্রজার সম্পদ, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়/কোম্পানী বাহাদুর বদ্ধ পরিকর জানিবেন। [...] হুকুম [...] নিজস্বার্থে দস্যুদিগের গতিবিধির সংবাদ সরবরাহ করুন।/[...] নিজস্বার্থে অবিলম্বে দস্যুদিগকে ধরাইয়া দিউন।/ [...] যদি কোনো গ্রামে দস্যুরা আশ্রয় লইয়াছিল এই সংবাদ পাওয়া যায়/সেই গ্রামে পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হইবে।/যদি কেহ দস্যুদিগের সংবাদ জানিয়াও গোপন করে/সেই ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইবে।/দস্যুদিগের পরিবারে প্রতিটি সদস্যকেও ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা যাইবে।/দস্যু কেহ ধরা পড়িলে তাহার ফাঁসী হইবে।/যাবত না পচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তাহার লাশ ঝুলিয়া রাখা হইবে। (সপ্তম দৃশ্য)

নূরলদীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত এই বিদ্রোহ আপাতভাবে দমিত হলো ঠিকই, কিন্তু কৃষকের অন্তরে থেকে গেল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্পৃহা। নাটকের শেষ দৃশ্যে আব্বাসের উচ্চারিত সংলাপে এ-সত্যটিই বিজ্ঞাপিত হয়েছে – ধৈর্য সবে – ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন।/লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন।' (চতুর্দশ দৃশ্য)

কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৩ সালে দেবী সিং কৃষকদের নিকট থেকে একপয়সাও খাজনা আদায় করতে পারেনি। ফলে রংপুর অঞ্চলেই সে-বছর প্রায় ৩,৯০,২০০ টাকার রাজস্ব অনাদায়ী থেকে যায়। এত বিপুল টাকার রাজস্ব হারানোর পর কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে, এবং তারা প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করার জন্য পিটারসন নামক একজন বিচক্ষণ ও সৎ অফিসারকে কমিশনার পদে নিযুক্ত করে রংপুর অঞ্চলে প্রেরণ করে। পিটারসন এ অঞ্চলে এসেই দেবী সিংয়ের অত্যাচারে সাধারণ কৃষক প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান; এবং অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে কোম্পানির কলকাতা অফিসে পত্রমাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য জ্ঞাপন করেন:

> আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদের উপর কঠোর অত্যাচার, এবং তাহারই জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে সে কথা সাধারণ ভাবে বিবৃত করিয়াছি। [...] আমার প্রতিদিনের অনুসন্ধানে তাহা আরও দৃঢ় হইতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হয় নাই, তাহাদের উপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে। [...] মানুষ চির অধীন অবস্থায় থাকিলেও যেখানে অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে, সেখানে প্রতিবিধানের জন্য তাহাদের বিদ্রোহ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। (সুপ্রকাশ, ২০১২: ১১১)

পিটারসনের এই রিপোর্টে কোম্পানি দেবী সিংকে উক্ত এলাকা থেকে আপাত বহিষ্কার করে কৈফিয়তের জন্য কলকাতায় ডেকে পাঠায়। এসময় দেবী সিং বিপুল অংকের টাকা নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। ১৭৮৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তৎকালীন সাংসদ এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্টের পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন তখন ভারতবর্ষে হেস্টিংস এবং তার দোসর কর্তৃক সীমাহীন দুর্নীতি, পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।[৪] *Burkes Speech* at *the Impeachment of Warren Hastings* (Banggabashi press, Calcutta, 1909) – গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে রংপুর অঞ্চল থেকে দেবী সিং রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যের থেকেও অতিরিক্ত বিপুলসংখ্যক অর্থ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেছিলেন । এই বিপুল টাকার মধ্য থেকে প্রায় ৭০ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করে তিনি কলকাতায় গিয়ে কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাত করে পিটারসনের সত্য রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। (ফরিদ, ২০১৫) কিন্তু ইতোমধ্যে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হলে তার স্থলে নতুন গভর্নর লর্ড কর্নওয়ালিশ আসেন। তিনি এ অঞ্চলে ইজারাদার প্রথা বাতিল করে ১৭৯০ সালে জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করলে দেবী সিং এ-অঞ্চল থেকে আয় করা বিপুল টাকায় মুর্শিদাবাদে জমিদারি ক্রয় করে সেখানেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

বলা বাহুল্য, কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত প্রথায় এ অঞ্চলের মানুষ সাময়িকভাবে দেবী সিংয়ের অপপ্রভাব থেকে মুক্তি পেলেও নতুন আইনে তারা আবারও জমিদার-ভূস্বামী কর্তৃক

নির্যাতিত হতে থাকে। কিন্তু তারা আর মুখ বুজে সব সহ্য না করে নূরলদীনের প্রদর্শিত পথে প্রতিবাদ-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। নূরলদীনের মৃত্যু তাদের চোখে জাগিয়ে দিয়েছে সম্ভাবনার স্বপ্ন, বুকে দিয়েছে প্রতিবাদের সাহস। নূরলদীনের চেতনাকে ধারণ করেই তারা আগামীর পথে হেঁটে গেছে। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক তাই প্রথম দৃশ্যেই মৃত নূরলদীনের পুনরুত্থান দেখিয়েছেন। এ উত্থান শরীরী নয়; এ উত্থান বোধের, এ উত্থান চেতনার। সাধারণ মানুষকে নূরলদীন বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, 'হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই'। এবং মানুষ বিশ্বাস করেছে: 'আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,/আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়/দিবে ডাক, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?' (প্রস্তাবনা)

নূরলদীনের সারাজীবন ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে নির্মিত শিল্পকর্ম। এই নাটকে ইতিহাস আশ্রিত জীবননদীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সমকালীন জীবনস্রোত। যে কারণে নাটকটি গ্রন্থের পাতা থেকে উঠে এসে সহজেই সাধারণ মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। এ নাটকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে দেশের প্রতি, মাটি ও মানুষের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা। সৈয়দ শামসুল হকের মতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দাবি আদায়ের প্রেক্ষাপটে বাঙালির সমবেত জাগরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফলে আলোচ্য কাব্যনাটকে ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে যে জৈব-ঐক্য নির্মিত হয়েছে বাংলা নাটকের ধারায় তা অভিনব ঘটনা। নাট্যকার স্বয়ং নূরলদীনের চরিত্রনির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন, নূরলদীনের আত্মা এবং প্রেরণা তিনি পেয়েছেন ইতিহাসের পাতা থেকে, কিন্তু ব্যক্তিজীবন এবং মানসিক সংকটকে তিনি কবির কল্পনা দিয়ে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। নূরলদীনের এই প্রতিবাদ হয়তো আধুনিক সমরাস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে ধসে পড়েছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনি উপ্ত করেছেন বাঙালির স্বাধিকারের মন্ত্রবীজ। তার মৃত্যুর পর সমবেত শক্তির জাগরণের এই সম্ভাবনা চিহ্নিত হয়েছে নূরলদীনের বন্ধু আব্বাসের কণ্ঠে: 'এ সংগ্রাম চলতেই থাকবে।'

বস্তুত, 'জাতিসত্তার উৎস ও অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রশ্নে এবং সমকালের বিপন্নতা উত্তরণের বাসনায়, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা কখনো কখনো বিচরণ করেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যলোকে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যলালিত শিল্পকলা ধস-আক্রান্ত অবরুদ্ধ পথ হারা একটি জাতিকে দিকনির্দেশ করতে পারে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৭: ৭২১) প্রতিভাবান শিল্পী সৈয়দ শামসুল হকও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি 'ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহার করলেন *নূরলদীনের সারাজীবন* কাব্যনাট্যে। এর আগে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্যনাট্যে ব্যবহার করেছিলেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে। স্বদেশ, সমাজে ও স্বদেশের বীর সন্তানদের নিয়ে উভয় নাটকের কাহিনি বিস্তৃত। সে হিসেবে দুটো নাটকের মূল সুর একই। তবে *নূরলদীনের সারাজীবন*-এ তাঁর পরীক্ষার আরো একটি পর্যায় সম্পন্ন হয়েছে। বিষয় হিসেবে এ নাটকে তিনি সুদূর অতীতকালের ঘটনা নিয়েছেন। বলা যায়, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, ইতিহাস, স্বদেশ, সমাজকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের দৃষ্টিকে শেকড়ের দিকে নিয়ে গেছেন। (মোস্তফা, ২০০৮: ১৯৮)

নূরলদীনের সারাজীবন নাটকে নূরলদীনের সংগ্রাম ও জীবনোৎসর্গের নাট্যরূপাঙ্কনের মাধ্যমে সৈয়দ শামসুল হক এ সত্যটি প্রতিপাদন করেছেন যে, কেন্দ্র অথবা প্রান্তিক যে

অবস্থানেই হোক না কেন, একটি সমাজ বা জাতিসত্তার নেতৃত্বদানের যোগ্যতা সে ব্যক্তিরই রয়েছে যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন। সাধারণকে ভালোবেসেই তিনি হয়ে ওঠেন অসাধারণ। নূরলদীন আমাদের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের সেই নায়ক, যিনি একটি ভূখণ্ডের নির্যাতিত কৃষিজীবী পরিশ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে অকাতরে লড়াই করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম এবং অকুণ্ঠ আত্মদান প্রতিযুগের নিপীড়িত ব্যক্তি বা জাতিসত্তার জন্য অনুপ্রেরণাসঞ্চারী।

টীকা

১. সৈয়দ শামসুল হকের রচিত এবং প্রকাশিত কাব্যনাট্যের সংখ্যা দশ: *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৫), *গণনায়ক* (১৯৭৬), *এখানে এখন* (১৯৮১), *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮২), *ঈর্ষা* (১৯৯০), *নারীগণ* (২০০৫), *চম্পাবতী* (২০০৮), *অপেক্ষমান* (২০০৯), *উত্তরবংশ* (২০০৮), *মরা ময়ূর* (২০14)। এগুলো তিনি জীবিতাবস্থায় সম্পাদনা করে একই গ্রন্থভুক্ত করে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন *সৈয়দ শামসুল হক: কাব্যনাট্যসমগ্র*। প্রকাশক: চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০১৬ ।

২. এক সাক্ষাৎকারে সৈয়দ শামসুল হক বলেন: ‘উত্তরাধুনিকতা সম্পর্কে আমাকে বলবেন না। আমি এই ধরনের লেভেলিংয়ে বিশ্বাস করি না। আমার কাজ হচ্ছে লেখা। যারা বটানি করেন তারা বটানি করুন। আমি গাছ, আমার গাছে ফুল ধরবে, ফল ধরবে। এটিই হচ্ছে আমার প্রতিক্রিয়া। আমি একাডেমিশিয়ান নই। আমি ক্রিয়েটিভ মানুষ। আমি সৃজনশীল মানুষ। আমি পণ্ডিত নই।’ (দ্রষ্টব্য: ‘অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার: রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর’, *মাসিক বলাকা,* সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক: শরীফা বুলবুল, ঢাকা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩৭, নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ১০

৩. ১৭৭২ সালে এদেশে প্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন মশিয়ে লুই বোনাদ নামে একজন ফরাসি বণিক। [...] যতদূর জানা যায় ১৭৮৮ সালের আগে বাংলাদেশে নীল চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি।’ (দ্রষ্টব্য: শাহরিয়ার ইকবাল, *নীল বিদ্রোহ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩)

৪. সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন: ইংলন্ডের পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া এডমন্ড বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরে যাহার পৈশাচিক তাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইংরেজ শাসকগণের লুণ্ঠনের সেই অংশীদার এবং গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রিয় সুহৃদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হইল ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের রংপুর বিদ্রোহ। (দ্রষ্টব্য: সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* র‌্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৫-১০৬)

সহায়কপঞ্জি

গ্রন্থ

অনুপম হাসান, ২০১০। *বাংলাদেশের কাব্যনাটক: বিষয় ও প্রকরণ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।
নিখিলনাথ রায়, ২০১৮। *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী,* দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০১৭। *সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য,* কবি প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ১৩৮২। *রংপুর জেলার ইতিহাস (প্রথম পর্ব),* রংপুর।

শান্তনু কায়সার, ২০১৮। *বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

শাহরিয়ার ইকবাল, ১৯৮৫। *নীল বিদ্রোহ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুপ্রকাশ রায়, ২০১২। *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০১৬। *কাব্যনাট্যসমগ্র,* চারুলিপি প্রকাশনী, ঢাকা।

Nurul Islam Khan [Ed.], 1977. *Bangladesh District Gazetteers Rangpur,* Bangladesh Government press, Dhaka

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

কিশোর সেনগুপ্ত, ২০১৭। 'নূরলদীনের সারাজীবন: আমাদের অন্বেষণ', হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ সম্পাদিত *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ: ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো....*চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

প্রীতিকুমার মিত্র, ২০০২। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস: ১৯৫৮-১৯৬৬', প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস: ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৭। 'কাব্যনাট্যের রাজপুত্র ও তাঁর নূরলদীন', হায়াৎ মামুদ ও পিয়াস মজিদ সম্পাদিত *সৈয়দ শামসুল হক স্মরণগ্রন্থ ফুলের গন্ধের মতো থেকে যাবো* ..... চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম, ১৯৯৪। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, মনসুর মুসা সম্পাদিত *বাঙলাদেশ,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রামেন্দু মজুমদার, ২০১৬। 'জীবন এত ছোট কেনে?', শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০১২। 'নাট্যকারের কথা, হোসনে আরা জলী *সম্পাদিত নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ,* অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

পত্রিকাভুক্ত প্রবন্ধ

অলোক বসু, ২০১৭। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উৎসারিত সৈয়দ হকের দু'টি নাটক', রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত *থিয়েটার,* সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা, ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা: এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা।

আতাউর রহমান, ২০১৬। সাক্ষাৎকার: 'হ্যামলেট প্রসঙ্গে আলাপচারিতা", মাজহারুল ইসলাম সম্পাদিত *পাক্ষিক অন্যদিন,* বর্ষ ২১ সংখ্যা ১৪, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকা।

ফরিদ আহমেদ, ২০১৫। 'জাগো বাহে কোনঠে সবায় blog.mukto-mona.com, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।

ফিচার, ২০১১। ''মাটির নবাব নূরলউদ্দীন', 'অন্য আলো', মতিউর রহমান সম্পাদিত *দৈনিক প্রথম আলো,* ৪ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।

মফিদুল হক, ২০১৭। সৈয়দ শামসুল হকের নাট্যত্রয়ী: তৃতীয় মাত্রার সন্ধানে', রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত *থিয়েটার,* সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা, ৪৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা: এপ্রিল ২০১৭, ঢাকা।

শফি আহমেদ, ২০১৬। শেক্সপিয়রের অনুবাদক সৈয়দ শামসুল হক, মাজহারুল ইসলাম সম্পাদিত *পাক্ষিক অন্যদিন,* বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৪, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০১৬। 'অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার: রাঢ় বাঙলার মুগ্ধ চিত্রকর', শরীফা বুলবুল সম্পাদিত *মাসিক বলাকা,* সৈয়দ শামসুল হক স্মরণ সংখ্যা, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৩৭, নভেম্বর ২০১৬, ঢাকা।